পুস্তক-সমালোচনা

সমাজের মানুষ সমবেত জনসভার মতো, যারা একে-অপরকে ঢিল ছুড়ে মারছে। যে মাথা তুলবে, তার মাথায় ঢিল লাগবে। যে যতো মাথা উঁচু ক'রে লম্বা হতে চাইবে, তার মাথা ও দেহে তত আঘাত আসবে।

আল্লাহর তওফীকে আমার লেখনী-জগতে মাথা উঁচু হয়েছে, তাই আমার প্রতি ঢিল আসাটা অস্বাভাবিক নয়।

অবশ্য প্রশংসাও আসছে, সৎপরামর্শও আসছে। আর সেই সাথে আসছে নানা অভিযোগ ও সমালোচনা।

(ক) একটি বড় অভিযোগ হল, আমার লেখা বাংলাদেশের সাহিত্য ও পরিভাষার সাথে খাপ খায় না। আমার ভাষায় ভাব-প্রকাশ বা অভিব্যক্তির ধরন ভিন্ন।

এ কথা শতভাগ সত্য। কারণ আমি বাংলাদেশী নই। আমি পশ্চিম বাংলার বর্ধমানের মানুষ। আমি সেখানকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে বড় হয়েছি। আর প্রত্যেক লেখক তার নিজস্ব পরিবেশ ও পরিমন্ডল তথা আঞ্চলিকতায় প্রভাবান্বিত হয়ে লিখে। স্থানীয় ভাষা-ভাব-ভঙ্গিমা, প্রবচন ও পরিভাষা তার সাহিত্যে ছায়া ফেলে। সুতরাং সমালোচক যদি বাংলাদেশী হন, তাহলে তাঁর মনের মতো লেখা হবে না, সেটাই স্বাভাবিক। যেমন বাংলাদেশের আঞ্চলিকতা-প্রভাবান্বিত কোন লেখা ও ভাষা পশ্চিম বাংলার লোকেদের কাছে শ্রুতিমধুর ও পাঠমধুর হবে না, সেটাই অনুমেয়।

(খ) আমি হিন্দী বলে আমার লেখায় নাকি বহু হিন্দী ও উর্দু শব্দের প্রয়োগ ঘটে থাকে।

এটাও স্বাভাবিক। তাছাড়া আমি উর্দু-মিডিয়ামের ছাত্র। হিন্দী-প্রধান দেশের মানুষ। তার একটা প্রভাব তো থাকবেই। কিন্তু শুধু আমারই নয়, অনেক বাংলাদেশী দ্বীনী লেখকের ভাষায় আরবী-উর্দু শব্দ স্বভাবতই প্রয়োগ হয়ে থাকে, যেহেতু তা শরয়ী পরিভাষা ও উর্দু শব্দের প্রভাব। এই জন্য 'ঈদগাহ, শরমগাহ, উঁট, ইঁট, ধোকা' ইত্যাদি স্থানীয় মুসলিমদের কাছে খুব পরিচিত শব্দ।

আসলে কোন কোন শব্দ এলাকাভিত্তিক প্রচলনের নিজস্ব স্থান ক'রে নেয় সাহিত্যে। এক ভাই বললেন, "হুজুর 'এঁটো' কী?" আমি বললাম, "এঁটো' মানে উচ্ছিষ্ট, খাবার শেষে অবশিষ্টাংশ খাদ্য।' তিনি বললেন, 'ওহো! আমরা তো ওটাকে 'ঝুটা' বলি।' অথচ আমাদের এলাকায় উক্ত শব্দ পরিচিত নয়। অনুরূপ 'লঙ্কা' বললে অনেকে 'শ্রীলঙ্কা' বুঝে। হিন্দী শব্দ 'মরিচ'কে যে বাংলায় 'লঙ্কা' বলা হয়, তা হয়তো অনেকের অজানা।

আমি মনে করি, আঞ্চলিকতার এই ভাষা-পার্থক্য নিয়ে সমালোচনা করা বাচালতা ছাড়া কিছু নয়। প্রত্যেকের উচিত, প্রত্যেক লেখা দ্বারা উপকৃত হওয়া।

(গ) বাংলা উচ্চারণেও আমি বাংলাদেশের রীতি থেকে ভিন্ন। আমাদের পরিবেশের মানুষ আরবী অক্ষর সীন বা স্বাদের উচ্চারণ 'চ' বা 'ছ' দিয়ে করে না। 'স'-এর উচ্চারণ থেকে বহু গভীর 'চ'-এর উচ্চারণ এবং তার থেকেও আরো গভীর 'ছ'-এর উচ্চারণ। পূর্ব বাংলায় 'চ-ছ'-এর উচ্চারণ 'সীন' বা 'স'-এর মতো হয় বলেই কোন সূফীবাদী যিক্‌রের সময় নাচের দলীল দিয়ে সূরা নাসের কয়েকটি আয়াত পেশ ক'রে বলে, 'কুল আউযো বেরব্বিন নাচে, মালিকিন নাচে, ইলাহিন নাচে....' অর্থাৎ, 'রব নাচে, মালিক নাচে, ইলাহ নাচে' অতএব ওহে বান্দারা তোমরাও নাচো!

অনেকেই 'ক্বুল আউযু বিরাব্বিন নাছ, মালিকিন নাছ, ইলাহিন নাছ,' লিখে থাকেন। আমি মনে করি, আরবী সীনের প্রতিবর্ণ বাংলায় যখন 'স' রয়েছে এবং 'নাছ'-ওয়ালা লেখকই তা অনেক জায়গায় প্রয়োগও করেন, তাহলে সকল জায়গায় 'স' লিখাই উচিত। কারণ আমাদের দেশের অধিকাংশ এলাকায় কুরআনের আয়াত ঐভাবে ভুল পড়বে। দরূদে 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম' ভুল পড়বে। আর তাতে 'দাদা' বলতে 'গাধা' বলারই কাছাকাছি হয়ে যাবে।

অনেকে আরবী প্রতিবর্ণায়নে আরো অনেক ভুল ধরে থাকেন। অথচ বাংলা বর্ণমালা দ্বারা আরবী প্রত্যেকটি বর্ণের প্রতিবর্ণায়ন সম্ভব নয়। সম্ভব নয় আরবী প্রত্যেক শব্দের সঠিক উচ্চারণ করা। আর তা করতে গেলেও বাংলার সৌন্দর্য ও মাধুর্য হারিয়ে যাবে।

যেমন ধরুন, 'হারাম' না 'হেরেম'? হেরেম হারীমের অপভ্রংশ নয়; বরং হারামের। হারাম; অর্থাৎ পুরুষের জন্য প্রবেশ-নিষিদ্ধ স্থান অন্তঃপুর। যে 'হেরেম' বলে তাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রত্যক্ষ নাফরমান বলতে পারেন কি? কোন শব্দের বিকৃত রূপ একই অর্থে ব্যবহার করলে তাতেও কি বিরাট ভুল হয়? আমরা বাঙালী

حرامকে কয়জন حرام বলি? অধিকাংশ বরং সবাই তো هرمই বলে থাকি। তাহলে তাতেও কি কুরআন ও সুন্নার প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধাচরণ হয় না? আমার মনে হয়, এটি খাওয়া বা করা (হারাম) থেকে মক্কা-মদীনার (হারাম)কে পৃথক করার জন্য ভাষাবিদরা হেরেম ব্যবহার করেছেন। অনুরূপ সাহারী না সেহেরী তা নিয়ে বিরাট হৈ-চৈ শুনে থাকবেন। কিন্তু এই শব্দ ও তার বিকৃত রূপ নিয়ে কালি-খাতা-পাতা খরচ করায় কি কোন লাভ আছে? হ্যাঁ, কোন শরয়ী ক্ষতি থাকলে সে কথা ভিন্ন। আমার মনে হয়, গালৎ, গাদব, বারকাত ইত্যাদি বাংলায় ব্যবহৃত শব্দকে আরবীর মত ব্যবহার করা تكلف ছাড়া কিছু নয়। বাংলার বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা বজায় না রাখলে ভাষার সে মাধুর্য থাকে না। আর কতই বা শুদ্ধ উচ্চারণ লিখবেন। বাংলার অধিকাংশ শব্দই তো বিদেশী; আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরেজী প্রভৃতি। গলদ বা গলতকে গালাৎ, গযবকে গাদাব, কৈফিয়তকে কাইফিয়াত, অত্যাচারকে অতিয়াচার, দ্বারাকে দোয়ারা, টেবিলকে টেবল, আলমারীকে আলমিরাহ ইত্যাদির মত শত শত পরিবর্তন ঘটালে বাংলার অবস্থা কাংলা হবে না কি? তাছাড়া খেয়াল করেছেন, আরবরা কিন্তু আরবীর স্বকীয়তা বজায় রেখেই অন্য ভাষার শব্দ ব্যবহার করে। চা, টেলিভিশন, ফ্যাক্স প্রভৃতি শব্দ তার দলীল। সুতরাং 'নবী' নয় 'নাবী', 'ইবাদত' নয় 'ইবাদাত', 'মসজিদ' নয় 'মাসজিদ' ইত্যাদি বিদেশী শব্দের উচ্চারণ নিয়ে পুস্তক-সমালোচনাও বাচালতা বৈ কিছু নয়।

(ঘ) আমি অবশ্য দাবী করছি না যে, আমার কোন ভুল নেই, অথবা আমি সমালোচনার ঊর্ধ্বে। যে কিতাবের প্রথম দাবী ছিল 'এই কিতাবে কোন সন্দেহ নেই', সেই কিতাবই সন্দেহ ও সমালোচনার ঊর্ধ্বে থাকতে পারেনি। তাহলে আমার মতো খুদে লেখকের কিতাব সমালোচনার ঊর্ধ্বে থাকবে কীভাবে?

আমি গঠনমূলক সমালোচনাকে স্বাগত জানাই। আমি জানি, জ্ঞানিগণ বলেছেন, 'কিছু না করলে সমালোচনার পাত্র হতে হয় না। যত বেশি লক্ষ্য সিদ্ধির পথে এগোবেন, ততই সমালোচিত হওয়ার ঝুঁকি বাড়বে। মনে হয় সাফল্য ও সমালোচনার মাঝে একটি যোগসূত্র আছে। সাফল্য যত বেশি, সমালোচনাও তত বেশি।'

তবে ভাঙ্গনমূলক সমালোচনাকে কেউই পছন্দ করে না। যারা 'না-ক্বিদ' নয়, বরং 'হা-ক্বিদ' অর্থাৎ সমালোচক নয়, বরং হিংসুক, যারা দেশ বা জাতিগত পক্ষপাতিত্ব অথবা আক্বীদা বা মযহাবগত পক্ষপাতিত্ব মনে-মগজে রেখে সমালোচনা করে, তাদের সমালোচনাকে কোন ন্যায়পরায়ণ মানুষ স্বাগত জানায় না।

এমন অনেকে 'লেখা'র সমালোচনা করে, যাদের লেখার ময়দানে দেখা মেলে না। ওস্কার ওয়াইল্ড্ বলেছেন, 'যারা প্রত্যেক বস্তুরই দাম জানে, কিন্তু কোন বস্তুরই প্রকৃত মূল্য জানে না, তারাই সমালোচক।'

এই শ্রেণীর সমালোচকদের জন্য সমালোচনা বড্ড সহজ। কিন্তু কঠিন হল রচনা করা।

"বোলতা কহিল, 'এ যে ক্ষুদ্র মউচাক,
এরই তরে মধুকর এত করে জাঁক!'
মধুকর কহে তারে, 'তুমি এসো ভাই,
আরো ক্ষুদ্র মউচাক রচো দেখে যাই।"

(ঙ) আমার ক্ষমতা ও পরিসীমার ভিতরে থেকে আমি লিখি। জরুরী নয়, আমার লেখা সমালোচকের মেজাজ মতো হবে। আমি যে ঝাল-মিষ্টি খাই, জরুরী নয়, তা সমালোচকের জিহ্বা-স্বাদের অনুকূল হবে। কোন জরুরী নয় পূর্ব বাংলার লেখাকে পশ্চিম বাংলার 'দাদা-বাবু'দের ভাষার ছাঁচে ঢালা। অনুরূপ পশ্চিম বাংলার কোন লেখাকে পূর্ব বাংলা লেখার ওজন-যন্ত্রে ওজন করা। প্রত্যেক লেখাকেই নিজস্ব স্বাধীনতা, স্বকীয়তা ও স্বীয় অবস্থায় রেখে উপকৃত হওয়া যাবে। চেষ্টা রাখতে হবে একে অন্যের ভাষাকে জানার ও বুঝার। নিজে বুঝি না বলে অথবা নিজের মনোমতো নয় বলে, অপরের ভাষারই পরিবর্তন ঘটাতে হবে---এমন কোন কথা নয়।

(চ) অনুবাদে ভুল হতেই পারে, প্রতিশব্দ চয়নেও ভুল অস্বাভাবিক নয়। যদিও তা মেজাজ ও পছন্দেরই ব্যাপার। অনুরূপ ভুল হতে পারে শব্দবিন্যাস বা মুদ্রণে। এই শ্রেণীর ভুল ধরিয়ে যাঁরা আমাকে সঠিকতা জানিয়ে দেন, তাঁকে আমি ধন্যবাদ ও দুআ জানাই।

তবে এ কথাও ঠিক যে, অনেক সমালোচক ভুল ধরতে গিয়ে নিজেই ভুলের ফাঁদে পড়েন। যেমন এক বইয়ে ভারত-বাংলাদেশকে 'উন্নয়নশীল' দেশ বলাতে তিনি ভুল ধরে লিখেছেন, 'লেখক ভারত-বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ বলে উল্লেখ করেছেন, অথচ সে দেশ দু'টি উন্নত নয়।'

(ছ) কোথাও কোথাও আমি নাকি অশোভনীয় শব্দ প্রয়োগ করি।

কোন কোন সমালোচকের সুসভ্য খুঁতে মেজাজে কোন কোন শব্দকে অশোভনীয় 'নালায়েক' মনে হয়েছে। যেমন 'রমণী'। এতে যেহেতু রমণের অর্থ আছে, তাই মহিলার জন্য এমন শব্দ প্রয়োগ করা নাকি অশোভনীয়। অথচ বড় বড় সাহিত্যিকরা সে শব্দ ব্যবহার ক'রে থাকেন। 'সোচ্চার' মানে পাখির পায়খানা হলেও 'সরব' হওয়ার অর্থে ব্যবহার হয়। আলিঙ্গনের আসল অর্থে লিঙ্গালিঙ্গি থাকলেও কোলাকুলির অর্থে তা ব্যবহার হয়। গভীরতায় না গিয়ে ব্যবহারিক অর্থই সাধারণ মানুষ জানে ও বুঝে, নিগূঢ় অর্থ বুঝে কেউ অশ্লীলতার গন্ধ পায় না।

তাছাড়া প্রবাদে প্রচলিত বহু এমন বাক্য আছে, যাতে অশোভনীয় শব্দ প্রয়োগ হয়ে থাকে। সেটা তো আমার নিজস্ব প্রয়োগ নয়। সে শব্দ বাদ দিলে প্রবাদের মিষ্টতাই শেষ হয়ে যাবে।

পরিশেষ বলি, সাহিত্য রস, লেখকের নিজস্ব রচনাশৈলী। সেই রস দিয়ে সকল মানুষের মনকে মাতানো যাবে না। বিশেষ ক'রে কেবল দোষ খোঁজার সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে রসের জায়গায় বিষই পাওয়া যাবে।

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} (٧٠) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। (আহ্যাব ঃ ৭০)

{وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} (١٥٢) سورة الأنعام

অর্থাৎ, পরিমাপ ও ওজন ন্যায়ভাবে পুরাপুরি প্রদান কর। আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। আর যখন তোমরা কথা বলবে, তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায় কথা বল। (আন্আম ঃ ১৫২)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (٨) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে (হকের উপর) দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত (এবং) ন্যায়পরায়ণতার সাথে সাক্ষ্যদাতা হও। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার না করাতে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর, এটা আত্মসংযমের নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন। (মায়িদাহ ঃ ৮)

মহান আল্লাহ আমাদেরকে কথা ও কাজে, বিচারে ও সমালোচনায় ন্যায়পরায়ণ হওয়ার তওফীক দিন। দেশী, মযহাবী বা আক্বায়েদী পক্ষপাতিত্বকে প্রশ্রয় দিয়ে অপরের কর্মকে ছোট ক'রে দেখা থেকে দূরে রাখুন। আমীন।